তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

৬ষ্ঠ খণ্ড

[সূরা মারইয়াম, সূরা তোয়া-হা, সূরা আম্বিয়া, সূরা হজ্জ, সূরা আল-মু'মিনুন, সূরা আন-নূর, সূরা আল-ফুরকান, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আন্-নাম্‌ল, সূরা আল-কাসাস, সূরা আল-আনকাবুত ও সূরা রূম]

মূল

হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণে

অনুবাদকের আরয

রাব্বুল আলামীনের অসীম অনুগ্রহে 'তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন'-এর ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ্! সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্র। তাঁর তওফীকেই অসহায় বান্দার পক্ষে বড় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব। তিনিই সব কাজের নিয়ামক। অবশিষ্ট দুটি খণ্ডের মুদ্রণকার্য দ্রুত সমাপ্ত হওয়ার জন্য তাঁরই তওফীক ভিক্ষা করি।

দরূদ ও সালাম হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি, একমাত্র যার পথ লক্ষ্য করেই কামিয়াবীর মনজিলে-মকসুদে পৌঁছা সম্ভব।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ তফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল-কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পাক কোরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে-কিরাম, তাবেঈন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষিগণের ব্যাখ্যা-বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের বিজ্ঞান-ভিত্তিক জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে।

এ কারণেই উর্দু ভাষায় রচিত এ তফসীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই সর্বমহলে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় এর অনুবাদও হয়ে গেছে। একই কারণে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর তরফ থেকে এই অসাধারণ গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বিরাট প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ অনুবাদ ও মুদ্রণকার্য ফাউণ্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমার উপর ন্যস্ত করেন। আল্লাহ্র শোকর যে, আট খণ্ডেরই অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে এবং মুদ্রণ কাজ দ্রুত চলছে।

এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে আমি কয়েকজন বিজ্ঞ আলেমের সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাঁরা সম্পাদনা, সমীক্ষা ও যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে মুদ্রণের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করে যাচ্ছেন।

এ খণ্ডটি দ্রুত প্রকাশ করার ব্যাপারে যাঁরা আমাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞ মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা আবদুল আজীজ, হাফেজ

মাওলানা আবু আশরাফ ও জনাব শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হয়।

প্রথম থেকে এ পর্যন্ত সবগুলো খণ্ডেরই অনূদিত পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষা কার্য সমাধা করেছেন ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসার হেড-মওলানা প্রখ্যাত আলেম হযরত মওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আ.জ.ম. শামসুল আলম, প্রাক্তন সচিব জনাব মুহাম্মদ সাদেক উদ্দিন, বর্তমান প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখ সুধী ব্যক্তি আন্তরিক আগ্রহ সহকারে তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ কার্য ত্বরান্বিত করার জন্য আমাকে সর্বক্ষণ তাকিদ ও সহযোগিতা করেছেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলি দ্রুত মুদ্রণের ব্যাপারে বর্তমান মহাপরিচালক জনাব আ.ফ.ম. ইয়াহইয়া নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আল্লাহ্ পাক এদের সবাইকে যোগ্য প্রতিদান দান করবেন। আমীন!

অনুবাদ ও মুদ্রণ কাজ নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। তাই সুধী পাঠকগণের খেদমতে আরয, কোথাও কোন ত্রুটি দেখা গেলে সংশোধনের নিয়তে সরাসরি আমাদেরকে অথবা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগকে অবহিত করলে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তা সংশোধন করা হবে।

পাঠকগণের খেদমতে আমরা দোয়াপ্রার্থী, আল্লাহ্ পাক যেন আমাদেরকে অবশিষ্ট দুটি খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করার তওফীক দান করেন

বিনীত খাদেম

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

জমাদিউল আওয়াল, ১৪০৩ হিঃ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা মারইয়াম	**১**
দোয়ার আদব	৫
পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকার	৫
মৃত্যু কামনা	১২
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম রহস্য	১৩
সিদ্দীক কাকে বলে?	২৩
ওয়াদা পূরণ ঃ সংস্কার কার্য	৩০
রসূল ও নবীর পার্থক্য	৩১
তিলাওয়াতের সময় কান্না	৩৩
সময়মত নামায ও জামা'আতের গুরুত্ব	৩৫
সূরা তোয়া-হা	**৫৩**
মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করেছেন	৬২
সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা	৬২
সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গীর গুরুত্ব	৭২
নবী রসূল নয়, এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি?	৭৬
মূসা-জননীর নাম	৭৭
মূসা (আ)-র কাহিনী	৭৮
মূসা (আ) ও ফিরাউনের কথা	১০০
অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা	১০১
কাউকে কোন পদ দান করার মাপকাঠি	১০৩
পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের মূলনীতি	১০৬
হযরত মূসার ভীতি	১০৮
মানুষের সমাধিস্থল	১১৪
মূসা (আ) ও যাদুকর প্রসঙ্গ	১২০
ফিরাউন-পত্নী আছিয়া প্রসঙ্গ	১২৪
বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ	১২৭
সামেরীর পরিচয়	১৩২
কাফিরের মাল প্রসঙ্গ	১৩৪
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব	১৫৬
জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী	১৫৭
পয়গম্বরগণের সম্মানের হিফাযত	১৫৮
কাফির ও পাপাচারীদের জীবন	১৫৯
শত্রুর নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায়	১৬৪
দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ	১৬৫
নামাযের জন্য নিকটতমদের আদেশ করা	১৬৬
সূরা আম্বিয়া	**১৬৯**
সূরা আম্বিয়ার ফযীলত	১৭২
মৃত্যু রহস্য	১৯৩
সুখ-দুঃখ উভয়টিই পরীক্ষা বিশেষ	১৯৪
ত্বরাপ্রবণতা নিন্দনীয়	১৯৪
হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত একটি হাদীস	২০৬
ইবরাহীম (আ) ও নমরুদের অগ্নি	২০৯
কোন বিষয়ে রায় প্রদান	২১৭
পর্বত ও পক্ষীকুলের তসবীহ	২১৯
হযরত দাউদ (আ) ও লৌহজাত শিল্প	২২০
সুলায়মান (আ) ও জ্বিন সম্প্রদায়	২২২
আইয়ুব (আ)-এর কাহিনী	২২৪
যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী	২২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনুস (আ)-এর কাহিনী	২৩১
সূরা হজ্ব	**২৪৬**
কিয়ামতের ভূ-কম্পন	২৪৭
মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর	২৫২
সমগ্র সৃষ্টিবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ	২৫৯
জান্নাতীদের পোশাক অলঙ্কার	২৬২
মসজিদুল-হারাম ও মুসলমানদের সম-অধিকার	২৬৬
হজ্ব ও কুরবানী প্রসঙ্গে	২৭২
জিহাদের প্রথম আদেশ	২৮৬
শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দেশ ভ্রমণ	২৯০
পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য	২৯১
সূরায়ে হজ্বের সিজদায়ে তিলাওয়াত	৩০৭
উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহ্‌র মনোনীত উম্মত	৩০৯
সূরা আল-মু'মিনুন	**৩১২**
সাফল্য কি এবং কি করে পাওয়া যায়	৩১৪
আয়াতে উল্লিখিত সাতটি গুণ	৩১৫
মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর	৩২৩
প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ	৩২৫
মানুষকে পানি সরবরাহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা	৩২৭
এশার পর গল্প করা	৩৪৬
মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব	৩৪৮
হাশরে মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থার পার্থক্য	৩৬০
আমল ওজনের ব্যবস্থা	৩৬২
সূরা আন-নূর	**৩৬৬**
ব্যভিচারের শাস্তি ও এর তাৎপর্য	৩৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর	৩৭৫
ব্যভিচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধান	৩৭৭
ব্যভিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান	৩৮১
মিথ্যা অপবাদ	৩৯৩
হযরত আয়েশা (রা)-র শ্রেষ্ঠত্ব	৪০০
একটি গুরুত্বপূর্ণ হুঁশিয়ারি	৪০৯
নির্লজ্জতা দমনের কোরআনী ব্যবস্থা	৪১১
সাক্ষাতকারের নিয়ম	৪১৭
অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা	৪২০
অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত আরো কতিপয় মাস'আলা	৪২৬
পর্দাপ্রথা	৪৩০
পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম	৪৩৩
সুশোভিত বোরকা ব্যবহার	৪৪০
বিবাহের কতিপয় বিধান	৪৪১
বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নাত	৪৪২
অর্থনীতি সম্পর্কিত কোরআনের ফয়সালা	৪৪৯
মু'মিনের নূর	৪৫৭
নবী করীম (সা)-এর নূর	৪৫৯
মসজিদের ফযীলত	৪৬৩
মসজিদের পনেরটি আদব	৪৬৪
অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন	৪৬৬
সাফল্য লাভের চারটি শর্ত	৪৭৪
খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত	৪৭৮
আত্মীয়-স্বজন ও মাহরামদের জন্য অনুমতি গ্রহণ	৪৮২
পর্দার হুকুমে আরো একটা ব্যতিক্রম	৪৮৫
গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিকতা	৪৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
রসূলে করীম (সা)-এর মজলিসের কতিপয় রীতি	৪৯২
সূরা আল-ফুরকান	**৪৯৫**
প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর বিশেষ রহস্য	৪৯৭
কোরআনের দাওয়াত প্রচার করা বড় জিহাদ	৫২৮
সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন	৫৩৩
কোরআনের তফসীর সম্পর্কিত বিশুদ্ধ মাপকাঠি	৫৩৫
সূরা আশ-শু'আরা	**৫৫৭**
কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সুখ্যাতি বজায় রাখার দোয়া	৫৭৯
মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া বৈধ নয়	৫৮১
সৎকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান	৫৮৫
ভদ্রতার মাপকাঠি শরীয়ত	৫৮৬
বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা	৫৮৯
উপকারী পেশা আল্লাহ্‌র নিয়ামত	৫৯২
অস্বাভাবিক কর্ম হারাম	৫৯৪
শব্দ ও অর্থ-সম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন	৬০৫
কবিতার সংজ্ঞা	৬০৮
ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান	৬০৯
যে জ্ঞান আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে	৬১০
সূরা আন-নামল	**৬১২**
প্রয়োজনে উপায়াদি অবলম্বন করা	৬১৬
মূসা (আ)-র আগুন দেখা	৬১৭
পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকার	৬২৩
পশু-পক্ষীর বুদ্ধি-চেতনা	৬২৪
শাসকের কর্তব্য	৬২৮
জিনের সাথে মানুষের বিবাহ	৬৩১
নারীর জন্য শাসক হওয়া	৬৩১
পত্র সম্পর্কিত কতিপয় আলোচনা	৬৩৩
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে পরামর্শ করা সুন্নত	৬৩৭
হযরত সুলায়মান ও বিলকীস প্রসঙ্গ	৬৩৯
কাফিরের উপঢৌকন	৬৪১
মু'জিযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য	৬৪৬
গায়েবের ইলম সম্পর্কিত আলোচনা	৬৬৪
মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা	৬৬৬
ভূগর্ভ থেকে জীব কখন নির্গত হবে	৬৬৮
সূরা আল-কাসাস	**৬৮০**
হযরত মূসা (আ)-র প্রসঙ্গ	৬৯৫
সৎকর্ম দ্বারা স্থানও বরকতময় হয়ে যায়	৭০৩
ওয়াজের ভাষা	৭০৩
তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি	৭১৩
'মুসলিম' শব্দ ও উম্মতে মুহাম্মদী	৭১৬
মক্কার বৈশিষ্ট্য	৭২৩
ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন	৭২৫
আল্লাহ্‌র ইচ্ছাই বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি	৭৩০
গোনাহের দৃঢ় সংকল্প ও গোনাহ্	৭৪১
সূরা আল-আনকাবুত	**৭৪৬**
পাপের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার পরিণতি	৭৫৩
দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত	৭৬০
আল্লাহ্‌র কাছে আলিম কে?	৭৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানব সংশোধনের ব্যবস্থাপত্র	৭৬৯
নামায পাপকার্য থেকে বিরত রাখে	৭৬৯
বর্তমান তওরাত ও ইনজীল সম্পর্কে হুকুম	৭৭৬
রসূলুল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ঃ নিরক্ষরতা	৭৭৭
হিজরত কখন ফরয বা ওয়াজিব হয়	৭৮১
সূরা আর—রূম	৭৯০
রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধ	৭৯২
পরকাল থেকে গাফেল হয়ে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করা	৭৯৬
আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী	৮০৬
বাতিলপন্থীদের সংসর্গ	৮১৯
বড় বড় বিপদ গোনাহের কারণে আসে	৮২৪
বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা ও আযাবের মধ্যে পার্থক্য	৮২৭
হাশরে আল্লাহ্‌র সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি?	৮৩৭

সূরা মারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كٓهٰيٰعٓصٓ ① ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ② اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ
نِدَآءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ
شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ
مِنْ وَّرَآءِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ⑤
يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ⑥ يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ
بِغُلٰمِ ِۨاسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ⑦ قَالَ رَبِّ اَنّٰى
يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
عِتِيًّا ⑧ قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ
قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ⑨ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى
اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ⑪ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑫ وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑬ وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ
يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ⑭ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ
يُبْعَثُ حَيًّا ⑮

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল-মনোরথ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষভাজন। (৭) হে যাকারিয়্যা, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্‌ইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমি যে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালন-কর্তা বলে দিয়েছেন ঃ এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে বলল ঃ (১২) হে ইয়াহ্‌ইয়া, দৃঢ়তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পর-হিযগার, (১৪) পিতামাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি---যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ—(এর মর্ম আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানেন) এটা (অর্থাৎ বর্ণিত কাহিনী) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বৃত্তান্ত তাঁর (প্রিয়) বান্দা (হযরত) যাকারিয়া (আ)-র প্রতি, যখন সে তার পালনকর্তাকে নিভৃতে আহবান করেছিল। (তাতে) সে বলল ঃ হে আমার পরওয়ারদিগার, আমার অস্থি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং (আমার) মাথার চুলের শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এই অবস্থার দাবী এই যে, আমি সন্তান লাভের অনুরোধ না করি; কিন্তু আপনার কুদরত ও রহমত অসীম) এবং (আমি এই কুদরত ও রহমত লাভে সদাসর্বদাই অভ্যস্ত। সেমতে ইতিপূর্বে কখনও) আপনার কাছে (কোন বস্তু) চাওয়ার ব্যাপারে হে আমার পালন-কর্তা বিফল মনোরথ হইনি। (এ কারণে দুষ্কর থেকেও দুষ্কর উদ্দিষ্ট চাওয়ার ব্যাপারেও কোন দোষ নেই। এই চাওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ এই দেখা দিয়েছে যে,) আমি আমার (মৃত্যুর পর) স্বজনদের (পক্ষ থেকে) ভয় করি (যে, তারা আমার ইচ্ছামত শরীয়ত

ও ধর্মের দায়িত্ব পালন করবে না। সন্তান চাওয়ার পক্ষে এটাই বিশেষ একটা কারণ। এতে করে সন্তান ও এমন ধরনের প্রার্থনা করা হল, যার মাঝে দীনের খিদমত সম্পন্ন করার মত গুণাবলীও থাকে।) এবং (যেহেতু আমার বার্ধক্যের সাথে সাথে) আমার স্ত্রী (ও) বন্ধ্যা; (যার দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও কখনও সন্তান হয়নি, তাই সন্তান হওয়ার প্রাকৃতিক কারণসমূহও অনুপস্থিত।) অতএব (এমতাবস্থায়) আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণাদির মাধ্যম ব্যতিরেকেই) এমন একজন উত্তরাধিকারী (অর্থাৎ পুত্র) দান করুন, যে (আমার বিশেষ জ্ঞানেগুণে) আমার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং (আমার পিতামহ) ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারের (ঐতিহ্যে তাদের) স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (অর্থাৎ সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জ্ঞানের অধিকারী হবে) এবং (আমলকারী হওয়ার কারণে) তাকে নিজের সন্তোষভাজন (ও প্রিয়) করুন। হে আমার পালনকর্তা (অর্থাৎ সে আলিমও হবে এবং আমেলও হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায় বললেন ঃ) হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহ্ইয়া। ইতিপূর্বে (বিশেষ গুণাবলীতে) আমি কাউকে তার সমগুণসম্পন্ন করিনি (অর্থাৎ তুমি যে ইল্‌ম ও আমলের দোয়া করছ, তা তো এ পুত্রকে অবশ্যই দেব, তদুপরি বিশেষ গুণও তাকে দান করব। উদাহরণত আল্লাহ্‌র ভয়ে বিশেষ পর্যায়ের হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এই দোয়া কবুলের মধ্যে সন্তান লাভের বিশেষ কোন অবস্থা হয়নি; তাই তা জানার জন্যে যাকারিয়া (আ) নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, কেমন করে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং (এদিকে) আমি নিজে তো বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছি? (অতএব জানি না আমরা যৌবন লাভ করব, না আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে, না বর্তমান অবস্থাতেই পুত্র হবে।) ইরশাদ হল ঃ (বর্তমান) অবস্থা এমনিই থাকবে, (এরই মধ্যে সন্তান হবে। হে যাকারিয়া,) তোমার পালনকর্তা বলেন, এটা আমার পক্ষে সহজ (শুধু এটি কেন, আমি তো আরও বড় কাজ করেছি। উদাহরণত) আমি পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ (সৃষ্টির পূর্বে) তুমি কিছুই ছিলে না। (এমনিভাবে প্রাকৃতিক কারণাদিও কিছুই ছিল না। যখন অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে আনা আমার জন্যে সহজ, তখন এক অস্তিত্ব থেকে অন্য অস্তিত্ব আনয়ন করা কঠিন হবে কেন? আল্লাহ্‌র এসব উক্তির উদ্দেশ্য ছিল হযরত যাকারিয়ার আশাকে জোরদার করা; সন্দেহ নিরসনের জন্যে নয়। কেননা, যাকারিয়ার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যখন) যাকারিয়া [(আ)-র আশা জোরদার হয়ে গেল, তখন তিনি] নিবেদন করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (আপনার ওয়াদায় আমি পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হলাম। এখন এই ওয়াদার বাস্তবায়ন নিকটবর্তী হওয়ার অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারেরও) আমাকে একটি নিদর্শন দিন (যাতে আরও অধিক শোকর করি। স্বয়ং বাস্তবায়ন তো বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই)। ইরশাদ হল ঃ তোমার (সে) নিদর্শন হল এই যে, তুমি তিন রাত (ও তিন দিন) কোন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারবে না, অথচ তুমি সুস্থ অবস্থায় থাকবে (কোন অসুখ বিসুখ হবে না। এ কারণেই আল্লাহ্‌র যিকরে মুখ খুলতে সক্ষম হবে। সেমতে আল্লাহ্‌র নির্দেশে যাকারিয়ার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তা'র

সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে বলল ঃ (কারণ, সে মুখে কথা বলতে সমর্থ ছিল না) তোমরা সকালে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (এই পবিত্রতা ঘোষণা ও পবিত্রতা ঘোষণার নির্দেশ হয় নিয়মানুযায়ী ছিল, সর্বদাই তার নবুয়তের কর্তব্য পালনকালে মুখে পবিত্রতা ঘোষণা করতে বলতেন; কিন্তু আজ ইঙ্গিতে বলছেন, না হয় নতুন নিয়ামত প্রাপ্তির শোকরানায় নিজেও অধিক পরিমাণে তসবীহ্ আদায় করেছেন এবং অন্যদেরকেও তদ্রূপ তসবীহ্ আদায় করতে বলেছেন। মোটকথা, অতঃপর ইয়াহ্ইয়া (আ) জন্মগ্রহণ করলেন এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলেন। তখন তাকে আদেশ করা হল ঃ হে ইয়াহইয়া, এ কিতাবকে (অর্থাৎ তওরাতকে, কারণ তখন তওরাতই ছিল শরীয়ত। ইনজীল পরে অবতীর্ণ হয়েছে।) দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর (অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা সহকারে আমল কর)। আমি তাকে শৈশবেই (ধর্মের) জ্ঞানবুদ্ধির এবং নিজের পক্ষ থেকে হৃদয়ের কোমলতা (গুণ) এবং (চারিত্রিক) পবিত্রতা দান করেছিলাম। (حكم বলায় জ্ঞান বুদ্ধি এবং حنان ও زكوة বলায় চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।) এবং (অতঃপর বাহ্যিক আমলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,) সে বড়ই পরহিযগার এবং পিতামাতার অনুগত ছিল। (এতে আল্লাহ্র হক এবং বান্দার হক উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে সে (মানুষের প্রতি) উদ্ধত (অথবা আল্লাহ্ তা'আলার) নাফরমান ছিল না। (সে আল্লাহ্র কাছে এমন গৌরবান্বিত ও সম্মানিত ছিল যে, তার পক্ষে আল্লাহ্র তরফ থেকে বলা হচ্ছে ঃ) তার প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলার) শান্তি (বর্ষিত) হোক যেদিন সে জন্মগ্রহণ করেছে, যেদিন সে মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন সে (কিয়ামতে) পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা কাহ্ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমনি ধরনের অত্যাশ্চর্য একটা বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবত এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে। ---(রূহুল মা'আনী)

كهيعص---এগুলো খণ্ডিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। বান্দার জন্য এর অর্থ অন্বেষণ করাও সমীচীন নয়।

نداء خفيا---এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্চস্বরে ও গোপনে করাই উত্তম। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনামতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ان خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى---অর্থাৎ অনুচ্চ যিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন যিকিরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় না এবং কমও হয় না)।---(কুরতুবী)

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا—অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থিই দেহের খুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اشتعال-এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া। এখানে চুলের শুভ্রতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা মুস্তাহাব ঃ এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ তা-ই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিধেয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তার তফসীর গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক। এ কারণেই আলিমগণ বলেন ঃ দোয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ও নিজের অভাবগ্রস্ততা বর্ণনা করা উচিত।

مَوَالِيَ—এটা مَوْلًى-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবিধ। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না ঃ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ—অধিক সংখ্যক আলিমের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমত হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ-সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা ঐকমত্য সম্বলিত একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر-

নিশ্চিতই আলিমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। "পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তারা ইল্‌ম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইল্‌ম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।"—(আহমদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

এ হাদীসটি কাফী, ফুলায়নী ইত্যাদি শিয়াগ্রন্থেও বিদ্যমান। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا نورث ما تركنا

صدقة আমাদের (অর্থাৎ পয়গম্বরগণের) আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব কেউ পায় না। আমরা যে ধন-সম্পদ ছেড়ে যাই, তা সবই সদকা।

স্বয়ং আলোচ্য আয়াতে يَرِثُنِي--এর পর وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ বাক্যের যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مَوَالِي তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার-আইনের পরিপন্থী।

রূহুল মা'আনীতে শিয়াগ্রন্থ থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে ঃ

روى الكينى فى الكافى عن ابى البخترى عن ابى عبد الله قال ان سليمان ورث داؤد وان محمدا صلى الله عليه وسلم ورث سليمان -

সোলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর ওয়ারিস হন এবং মুহাম্মদ (সা) সোলায়মান (আ)-এর ওয়ারিস হন।

বলা বাহুল্য, রসূলুল্লাহ্ (সা) যে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করবেন, এ বিষয়ের কোন সম্ভাবনাই নেই। এখানে নবুয়তের জ্ঞানের উত্তরাধিকারিত্বই বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ আয়াতেও সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

سَمِيٌّ— শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তার পূর্বে 'ইয়াহ্ইয়া' নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহ ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণত, চির-কুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহ্ইয়া (আ) পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের

চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ ও মূসা কলীমুল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।---(মাযহারী)

عِتِيًّا শব্দটি عُتُوٌّ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে আস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ)-র কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থাটি কোন রোগবশত ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে তার জিহ্বা তিনদিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল। বরং এ অবস্থা মু'জিযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حَنَانًا এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা। এটা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾
فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ
إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي
غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ
هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴿٢١﴾

(১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ্কে প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল ঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্-ভীরু হও। (১৯) সে বলল ঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাই। (২০) মারইয়াম বলল ঃ কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল ঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি

তাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [হে মুহাম্মদ (সা)] এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনের এই বিশেষ অংশে অর্থাৎ সূরায় হযরত) মারইয়াম (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করুন, [কারণ, এটা যাকারিয়া (আ)-এর উল্লিখিত কাহিনীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। এটা তখন ঘটে,] যখন সে পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকের একস্থানে (গোসলের জন্য) গেল। অতঃপর তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি (মধ্যস্থলে) পর্দা করে নিলেন, (যাতে এর আড়ালে গোসল করতে পারেন।) অতঃপর (এমতাবস্থায়) আমি আমার ফেরেশতা (জিবরাঈল)-কে প্রেরণ করলাম, তিনি তার সামনে (হাত, পা-সহ আকার-আকৃতিতে) একজন পূর্ণ মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। (হযরত মারইয়াম তাঁকে মানব মনে করলেন, তাই অস্থির হয়ে) বললেন ঃ আমি তোমা থেকে আমার আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, যদি তুমি (এতটুকুও) আল্লাহ্‌ভীরু হও (তবে এখান থেকে সরে যাবে)। ফেরেশতা বললেন ঃ আমি মানব নই যে, (তুমি আমাকে ভয় করবে) আমি তো তোমার পালনকর্তা-প্রেরিত (ফেরেশতা। আমার আগমনের উদ্দেশ্য—) যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করি। (অর্থাৎ তোমার মুখে অথবা বুকের উন্মুক্ত অংশে ফুঁমারি, যার প্রভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে গর্ভ সঞ্চার হয়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।) তিনি (বিস্ময়ভরে) বললেন ঃ (অস্বীকারের ভঙ্গিতে নয়) আমার পুত্র কিরূপে হবে, অথচ (এর অপরিহার্য শর্তাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে পুরুষের সাথে সহবাস। এটা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কেননা) কোন মানব আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি (অর্থাৎ আমার বিয়ে হয়নি) এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন ঃ (ব্যস, কোন মানবের স্পর্শ ব্যতীত) এমনিতেই (পুত্র) হয়ে যাবে। (আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না ; বরং) তোমার পালনকর্তা বলেছেন ঃ এটা (অর্থাৎ অভ্যস্ত কারণাদি ছাড়াই পুত্র সৃষ্টি করা) আমার পক্ষে সহজ এবং (আরও বলেছেন যে, আমি অপরিহার্য শর্তাবলী ছাড়া) বিশেষভাবে এজন্য সৃষ্টি করব, যাতে আমি এই পুত্রকে মানুষের জন্য (কুদরতের) একটি নিদর্শন ও (এর মাধ্যমে মানষের হিদায়েত পাওয়ার জন্য) তাকে আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের উপকরণ করে দেই। এটা পিতাবিহীন (এই পুত্রের জন্মলাভ) একটি স্থিরীকৃত ব্যাপার (যা অবশ্যই ঘটবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنْتَبَذَتْ—শব্দটি نبذ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। اِنْتِبَاذ- এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। مَكَانًا شَرْقِيًّا —অর্থাৎ পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ

ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্নরূপ বর্ণিত আছে। কেউ বলেন ঃ গোসল করার জন্য নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন ঃ অভ্যাস অনুযায়ী ইবাদতে মশগুল হওয়ার জন্য কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খৃস্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ——অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে রূহ্ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ স্বয়ং ঈসা (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ——ফেরেশতাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা মানুষের জন্য সহজ নয়—ভয়-ভীতি প্রবল হয়ে যায়; যেমন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) হেরা গিরি-গুহায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতরে আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসৎ বলে আশংকা করলেন। তাই বললেন ঃ

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ ——আমি তোমা থেকে আল্লাহ্ রহমানের আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে (আল্লাহ্র কথা শুনে) আল্লাহ্র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

إِن كُنتَ تَقِيًّا ——এ বাক্যটি এমন, যেমন কেউ কোন জালিমের কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে ঃ যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেওয়ার জন্য তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্য সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এ বাক্যটি আতিশয্য বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যদি তুমি আল্লাহ্ভীরুও হও, তবুও আমি তোমা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট।—(মাযহারী)

لِأَهَبَ لَكِ ——এখানে পুত্র সন্তান প্রদানের কাজটি জিবরাঈল নিজের বলে

ব্যক্ত করেছেন। কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মারইয়ামের বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। এই ফুঁ দেয়া পুত্র সন্তান প্রদানের উপায় হয়ে যাবে---যদিও প্রকৃতপক্ষে এ দান আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ
النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾
فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَ
هُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِىْ
وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ
لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾

(২২) অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুরবৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন ঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! (২৪) অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর জারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও ; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (২৬) এখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও ঃ আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (এই কথাবার্তার পর জিবরাঈল তাঁর বুকের উন্মুক্ত স্থানে ফুঁ মারলেন যদ্দরুন) তিনি গর্ভে পুত্র ধারণ করলেন। অতঃপর (যথাসময়ে মারইয়াম যখন গর্ভ ধারণের লক্ষণাদি অনুভব করলেন তখন) তৎসহ (নিজ গৃহ থেকে) কোন দূরবর্তী স্থানে (বন পাহাড়ে) একান্তে চলে গেলেন। এরপর (যখন প্রসব বেদনা শুরু হল তখন) প্রসব বেদনার কারণে খেজুর গাছের দিকে আশ্রয় নিলেন (যাতে তার ওপর ভর দিয়ে ওঠা-বসা করতে পারেন। এ সময় তার কোন সঙ্গী-সহচর ছিল না। তিনি ছিলেন ব্যথায় অস্থির। এমতাবস্থায় আরাম ও প্রয়োজনের যেসব উপকরণাদি থাকা উচিত ছিল, তাও অনুপস্থিত। তদুপরি সন্তান প্রসবের পর দুর্নামের আশংকা। অবশেষে

দিশেহারা হয়ে) বলতে লাগলেনঃ হায়! আমি যদি এ অবস্থার পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম! অতঃপর সে সময়েই আল্লাহ্‌র নির্দেশে (হযরত) জিবরাঈল (পৌঁছে গেলেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সম্মুখে উপস্থিত হলেন না; বরং যে জায়গায় মারইয়াম ছিলেন, সেখান থেকে নিম্ন ভূমিতে আড়ালে অবস্থান করলেন এবং তিনি) তাকে নিম্নস্থান থেকে আওয়ায দিলেন (মারইয়াম তাকে চিনলেন যে, তিনি ফেরেশ্‌তা, যিনি ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন) যে, তুমি উপকরণাদি না থাকার কারণে অথবা (দুর্নামের ভয়ে) দুঃখ করো না, (কেননা উপকরণাদির ব্যবস্থা এরূপ হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন (যা দেখলে এবং তার পানি পান করলে স্বাভাবিক প্রফুল্লতা অর্জিত হবে। রূহুল মা-'আনীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মারইয়াম তখন পিপাসার্তও ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী প্রসবের পূর্বে বা পরে গরম বস্তুর ব্যবহার প্রসব যন্ত্রণা নিরাময় করে, দূষিত রক্ত দূর করে এবং মনকে সতেজ ও শক্তিশালী রাখে। পানিতে যদি উত্তাপও থাকে—যেমন কোন কোন নহরের পানি এরূপ হয়ে থাকে, তবে তা মেযাজের আরও অনুকূল হবে। এ ছাড়া খেজুরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) থাকে। খেজুর রক্ত উৎপাদন করে, দেহে চর্বি সৃষ্টি করে এবং কোমর ও অস্থির জোড়কে শক্তিশালী করে দেয়। এ কারণে এটা প্রসূতির জন্য সব অষুধ ও খাদ্য থেকেই উত্তম। গরম হওয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির আশংকা থাকলেও পাকা খেজুরে উত্তাপ কম। যেটুকু থাকে, পানি দ্বারা তা সংশোধিত হয়ে যায়। এ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হলেই অনিষ্টকারিতা দেখা দিতে পারে। নতুবা কোন বস্তুই অল্প বিস্তর অনিষ্টকারিতা থেকে মুক্ত নয়। এছাড়া অভ্যাসবিরুদ্ধ কারামতের আত্মপ্রকাশ যেহেতু আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত, তাই তা আত্মিক প্রফুল্লতার কারণও বটে)। তুমি এই খেজুর গাছের কাণ্ডকে (ধরে) নিজের দিকে নাড়া দাও; তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর ঝরে পড়বে (এ ফল খাওয়ার মধ্যে আহারের স্বাদ এবং কারামত হিসেবে ফলন্ত হওয়ার কারণে আত্মিক স্বাদ উভয়ই একত্রিত আছে)। এখন (এ ফল) আহার কর, (নহরের পানি) পান কর এবং চক্ষু শীতল কর (অর্থাৎ পুত্রকে দেখার কারণে, পানাহারের কারণে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে আনন্দিত থাক)। এরপর (যখন দুর্নামের আশংকার সময় আসে অর্থাৎ কোন মানুষ যদি এ ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়, তখন এর ব্যবস্থাও এরূপ হয়েছে যে) যদি কোন মানুষকে (আসতে এবং আপত্তি করতে) দেখ তবে (তমি নিজে কিছু বলবে না; বরং ইঙ্গিতে তাকে) বলে দেবেঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (এমন রোযার মানত করেছি যাতে কথা বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং এ কারণে) আজ আমি (সারাদিন) কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (তবে আল্লাহ্‌র যিকর ও দোয়ায় মশগুল হয়ে যাওয়া ভিন্ন কথা। ব্যস তুমি এতটুকু জওয়াব দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলাই এই সদ্যজাত শিশুকে স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী পন্থায় কথা বলতে সক্ষম করে দেবেন। ফলে পবিত্রতা ও সতীত্বের অলৌকিক প্রমাণ আত্মপ্রকাশ করবে। মোটকথা সর্বপ্রকার দুঃখের প্রতিকার হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু-কামনার বিধান ঃ মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্থিব দুঃখের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগের প্রাধান্যকে এর ওযর বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন ; অর্থাৎ মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবত এর মুকাবিলায় আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারব না, ফলে বেসবর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গোনাহ থেকে বেঁচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে ঃ তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেন নি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে ঃ ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালি-গালাজ, মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথা-বার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন ইবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل অর্থাৎ সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন ইবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহার ও পান করার আদেশ বাহ্যত অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়। والله اعلم

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নয় ঃ পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভ ধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জিযা। মু'জিযায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই। বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশি করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসাশাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্যে ধারণ শক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারক শক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।---(বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনা-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহ্‌র কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।---(রূহুল-মা'আনী)

سَرِيًّا——এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারি করে দেন অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারি করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রিওয়ায়েতই বর্তমান আছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। كُلِي وَاشْرَبِي

কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে; বিশেষত ঐ খাদ্যের বেলায়, যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(রূহুল-মা'আনী)

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتَ
هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَأَشَارَتْ
إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَ
أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَ
لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿٣٢﴾ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ﴿٣٣﴾

(২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল ঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সন্তান বলল ঃ আমি তো আল্লাহ্র দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেন নি। (৩৩) আমার প্রতি

সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মোটকথা, এ কথায় মারইয়াম সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন।] অতঃপর তিনি তাকে কোলে নিয়ে (সেখান থেকে লোকালয়ের দিকে তিনি চললেন এবং) তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা (যখন দেখল যে, অবিবাহিতা মারইয়ামের কোলে সদ্যজাত শিশু, তখন কুধারণা করে) বলল ঃ হে মারইয়াম, তুমি বড় সর্বনাশা কাজ করেছ। (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ, অপকর্ম করেছ। এমনিতেও অপকর্ম যে কেউ করে, তা মন্দ; কিন্তু তোমা দ্বারা এরূপ হওয়া সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। কেননা) হে হারুন-ভগিনী, (তোমার পরিবারে কেউ কোনদিন এরূপ অপকর্ম করেনি। সেমতে) তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না (যে, তার প্রভাবে তুমি এরূপ করবে) এবং তোমার জননী ব্যভিচারিণী ছিল না (যে, তার কারণে তুমি এ কাজে লিপ্ত হবে। এরপর হারুন তোমার জ্ঞাতি ভাই। তার নাম হারুন নবীর নামানুসারে রাখা হয়েছে। সে কত ভাল লোক। মোটকথা, যার গোটা পরিবারই শুদ্ধ-পবিত্র, তার দ্বারা এরূপ কাণ্ড হওয়া কত বড় সর্বনাশের কথা!) অতঃপর মারইয়াম (এসব কথাবার্তা শুনে কোন উত্তর দিলেন না; বরং) শিশুর দিকে ইশারা করে দিলেন (যে, যা কিছু বলবার, তাকেই বল। সে উত্তর দেবে।) তারা (মনে করল যে, মারইয়াম তাদের সাথে উপহাস করছে, তাই) বলল ঃ সে মাত্র কোলের শিশু, তার সাথে আমরা কিরূপে কথা বলব? (কেননা, যে ব্যক্তি নিজে কথাবার্তা বলে, তার সাথেই কথা বলা যায়। সে যখন শিশু, তখন তো সে কথাবার্তাই বলতে সক্ষম নয়। তার সাথে কিরূপে কথা বলব? ইতিমধ্যে) সন্তান (নিজেই) বলে উঠল ঃ আমি আল্লাহ্‌র (বিশেষ) দাস (আল্লাহ্ নই; যেমন মূর্খ খৃস্টানরা মনে করবে এবং আল্লাহ্‌র অপ্রিয় নই; যেমন ইহুদীরা মনে করবে। দাস হওয়ার এবং বিশেষ দাস হওয়ার লক্ষণ এই যে) তিনি আমাকে কিতাব (অর্থাৎ ইনজীল) দিয়েছেন (যদিও ভবিষ্যতে দেবেন; কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন দিয়ে ফেলেছেন।) এবং তিনি আমাকে নবী করেছেন (অর্থাৎ করবেন) এবং তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন (অর্থাৎ মানবজাতি আমা দ্বারা উপকৃত হবে) আমি যেখানেই থাকি না কেন (আমার বরকত পৌঁছতে থাকবে। এ উপকার হচ্ছে ধর্ম প্রচার। কেউ কবুল করুক বা না করুক তিনি উপকার পৌঁছিয়ে দিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে নামায ও যাকাতের আদেশ দিয়েছেন যতদিন আমি (দুনিয়াতে) জীবিত থাকি। (বলা বাহুল্য, আকাশে যাওয়ার পর তিনি এসব বিষয়ে আদিষ্ট নন। এটা দাস হওয়ার প্রমাণ; যেমন বিশেষত্বের আরও প্রমাণাদি আছে) এবং আমাকে আমার জননীর অনুগত করেছেন (পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণের কারণে বিশেষ করে জননীর কথা বলেছেন) তিনি আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি (যে, মানুষের হক ও জননীর হক আদায় করতে অবাধ্য হব কিংবা হক ও আমল বর্জন করে দুর্ভাগ্য ক্রয়

করব) এবং আমার প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) সালাম যে দিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যে দিন মৃত্যুবরণ করব (এ সময়টি কিয়ামতের নিকটবর্তী আসমান থেকে অবতরণের পর হবে।) এবং যেদিন আমি (কিয়ামতে) জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (আল্লাহ্‌র সালাম বিশেষ বান্দা হওয়ার প্রমাণ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ----এ বাক্য থেকে বাহ্যত এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজেই সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে গৃহে ফিরে আসেন।---(রূহুল মা'আনী)

شَيْئًا فَرِيًّا ---আরবী ভাষায় فرى শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে فرى বলা হয়। আবূ হাইয়্যান বলেনঃ প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে فرى বলা হয়--ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যই শব্দটির ব্যবহার সুবিদিত।

يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ ---হযরত মূসা (আ)-র ভাই ও সহচর হযরত হারূন (আ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারূন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রসূলুল্লাহ্ (স) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা হয়েছে। অথচ হারূন (আ) তাঁর অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (স)-র কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ তুমি বলে দিলেনা কেন যে, বরকতের জন্য পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্বন্ধ করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। এক. হযরত মারইয়াম হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, তাই তাঁর সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে---যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; যেমন আরবদের অভ্যাস এই যে, তারা তামীম গোত্রের ব্যক্তিকে اخا تميم এবং আরবের লোককে اخا عرب বলে অভিহিত করে। দুই. এখানে হারূন বলে মূসা (আ)-র সহচর হারূন নবীকে বোঝানো

হয়নি; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নাম ছিল হারূন এবং এ নাম হারূন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়ামকে হারূন-ভগিনী বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ ---কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্ ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ্ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুযুর্গদের সন্তানদের উচিত, সৎ কাজ ও আল্লাহ্ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ---এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভৎর্সনা করতে শুরু করে, তখন হযরত ঈসা (আ) জননীর স্তন্যপানে রত ছিলেন। তিনি তাদের ভৎর্সনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তর্জনী খাড়া করে এ-কথা বলেন: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ---অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র দাস। এই প্রথম বাক্যেই হযরত ঈসা (আ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ্ নই---আল্লাহ্র দাস। অতএব কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ---এ বাক্যে হযরত ঈসা (আ) তাঁর দুগ্ধপানের যমানায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবুয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত ও কিতাব লাভ করেন নি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যথাসময়ে আমাকে নবুয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সা) বলেছেন: আমাকে নবুয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আ)-এর জন্মই হয়নি--তার খামীর তৈরী হচ্ছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবুয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সা)-র জন্য অকাট্য ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকারান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা আমার নবী হওয়া এবং রিসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ---তাকীদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ

দেওয়া হলে তাকে وصيت শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়্যত করেছেন। তাই এর অর্থ যে, খুব তাকীদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রসূলের শরীয়তে ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও খুঁটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্ন রূপ ছিল। হযরত ঈসা (আ)-র শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাঁকে যাকাতের আদেশ দেওয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের ওপর যাকাত ফরয---এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আ)-ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাঁকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়।---(রূহুল মা'আনী)

مَا دُمْتُ حَيًّا----অর্থাৎ নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্য সর্বকালীন ---যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলা বাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থানকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্ক-যুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

بَرًّا بِوَالِدَتِي----এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতামাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ
أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۖ سُبْحَانَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ۙ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي
ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي

غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ۝

(৩৪) এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র। সত্যকথা, সে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ্ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা স্থির করেন, তখন একথাই বলেন ঃ 'হও' এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার ওপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ-ই ঈসা মারইয়ামের পুত্র (যার উক্তি ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সে আল্লাহ্র দাস ছিল। খৃস্টানরা যে তাকে দাসদের তালিকা থেকে বের করে আল্লাহ্র স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে, তা সত্য নয়। এমনিভাবে ইহুদীরা যে তাঁকে আল্লাহ্র প্রিয় বলে স্বীকার করে না এবং নানাবিধ অপবাদ আরোপ করে, তাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত)। আমি (সম্পূর্ণ) সত্যকথা বলছি, সে সম্পর্কে (বাহুল্য ও স্বল্পতার আশ্রয় গ্রহণকারী) লোকেরা বিতর্ক করছে। সেমতে খৃস্টান ও ইহুদীদের উক্তি এইমাত্র জানা গেল। (যেহেতু ইহুদীদের উক্তি বাহ্যত ও পয়গম্বরের মর্যাদা হানিকর হওয়ার কারণে স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল, তাই তা খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। এর বিপরীতে খৃস্টানদের উক্তি বাহ্যত পয়গম্বরের অতিরিক্ত গুণ প্রমাণ করে। কারণ তারা নবীত্বের সাথে সাথে আল্লাহ্র পুত্রত্বও দাবী করে। তাই পরবর্তী আয়াতে তা খণ্ডন করা হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, এ উক্তির কারণে আল্লাহ্ তা'আলার তওহীদের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে তা স্বয়ং আল্লাহ্র মর্যাদা হানি করে। অথচ) আল্লাহ্ এরূপ নন যে, তিনি (কাউকে) পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। তিনি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। (কারণ) তিনি যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তাকে এতটুকু বলে দেন, 'হয়ে যা', অমনি তা হয়ে যায়। (এমন পরাকাষ্ঠাশালীর সন্তান হওয়া যুক্তিগতভাবে ত্রুটি।) এবং (আপনি তওহীদ প্রমাণের জন্য লোকদেরকে বলে দিন, যাতে মুশরিকরাও শুনে নেয় যে, নিশ্চয় আল্লাহ্

আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। অতএব (একমাত্র) তাঁরই ইবাদত কর। এটা (অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত তথা তওহীদ অবলম্বন করা) সরল পথ। অতঃপর (তওহীদের এসব যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণ সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল (এ সম্পর্কে) পরস্পরে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে। (অর্থাৎ তওহীদ অস্বীকার করে নানা রকম ধর্ম আবিষ্কার করেছে।) সুতরাং কাফিরদের জন্য মহাদিবসের আগমনকালে খুবই দুর্ভোগ হবে। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিবস। এই দিবস এক হাজার বছর দীর্ঘ ও ভয়াবহ হওয়ার কারণে মহাদিবস হবে।) তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা (হিসাব ও প্রতিদানের জন্য) আমার কাছে আগমন করবে। (কেননা কিয়ামতে এসব সত্যাসত্য দৃষ্টির সামনে এসে যাবে এবং সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।) কিন্তু জালিমরা আজ (দুনিয়াতে কেমন) প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে (পতিত) রয়েছে। আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন যখন (জান্নাত ও দোযখের) চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেওয়া হবে। [হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকে জান্নাত ও দোযখবাসীদের দেখিয়ে জবাই করে দেওয়া হবে এবং উভয় প্রকার লোকদেরকে অনন্তকাল তদবস্থায় জীবিত থাকার নির্দেশ শুনিয়ে দেওয়া হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) তখন যে অপরিসীম পরিতাপ হবে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।] তারা (আজ দুনিয়াতে) অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করে না (কিন্তু অবশেষে একদিন মরবে)। পৃথিবী ও তার ওপরে যারা রয়েছে, তাদের ওয়ারিস (অর্থাৎ সর্বশেষ মালিক) আমিই থেকে যাব এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে (এরপর তাদের কুফর ও শিরকের সাজা ভোগ করবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ—হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহুদী ও খৃস্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খৃস্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে 'খোদার বেটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তানরূপে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার ভ্রান্ত লোকদের ভ্রান্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন।—(কুরতুবী)

قَوْلَ الْحَقِّ—লামের যবরযোগে। এর ব্যাকরণিক রূপ হলো এরূপ أَقُوْلُ قَوْلَ الْحَقِّ কোন কোন কিরাআতে লামের পেশ যোগেও বর্ণিত রয়েছে। তখন অর্থ এই যে, ঈসা (আ) স্বয়ং قول الحق (সত্য উক্তি) যেমন তাকে كلمة الله (আল্লাহ্‌র

উক্তি) উপাধিও দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর জন্ম বাহ্যিক কারণের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে **আল্লাহ্র উক্তির মাধ্যমে হয়েছে।---(কুরতুবী)**

يَوْمَ الْحَسْرَةِ —কিয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে। কারণ জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎ কর্মপরায়ণ হলে জান্নাত লাভ করত ; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জান্নাতীদেরও হবে। হযরত মু'আযের রেওয়ায়েতে তাবা-রানী ও আবূ ইয়ালা বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (সা) বলেন ঃ যেসব মুহূর্ত আল্লাহ্র যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্য পরিতাপ করা ছাড়া জান্নাতীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বগভী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে, সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন ঃ এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে ? তিনি বললেন ঃ সৎ কর্মশীলদের পরিতাপ হবে এই যে, তারা আরও বেশী সৎ কর্ম কেন করল না, যাতে জান্নাতের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুকর্ম থেকে কেন বিরত হল না।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۬ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾ اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ
شَيْئًا ﴿٤٢﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْۤ اَهْدِكَ
صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾ يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ
عَصِيًّا ﴿٤٤﴾ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ
لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ
تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ
رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا
رَبِّيْ ۫ عَسٰۤى اَلَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ﴿٤٨﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا
يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ وَكُلًّا جَعَلْنَا

نَبِيًّا ﴿٤٩﴾ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ
عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

(৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় সে ছিল সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার ইবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে; যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি, দয়াময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন ঃ তোমার ওপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেরবান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর, তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার ইবাদত করব; আশা করি, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদের ইবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দিলাম সমুচ্চ সুখ্যাতি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি এই কিতাবে (কোরআনে) ইবরাহীম (আ)-এর কথা বর্ণনা করুন (যাতে তাদের কাছে তওহীদ ও রিসালতের ব্যাপারটি আরও ফুটে ওঠে।) সে (প্রত্যেক কথায় ও কাজে) খুবই সত্যবাদী (ছিল ও) নবী ছিল। (এখানে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, তা তখন হয়েছিল) যখন তিনি তাঁর (মুশরিক) পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা, তুমি এমন বস্তুর ইবাদত কর কেন, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না (অর্থাৎ প্রতিমা; অথচ কোন বস্তু দর্শক, শ্রোতা ও উপকারী হওয়ার পরও যদি 'সদাসর্বদা আছে এবং সদাসর্বদা থাকবে'---এরূপ না হয়, তবুও সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় যার মধ্যে এসব গুণও নেই, সে উত্তমরূপে ইবাদতের যোগ্য হতে পারে না।) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি (অর্থাৎ ওহী; এতে ভ্রান্তির আশংকা মোটেই নেই।

সুতরাং আমি যা কিছু বলছি, তা নিশ্চিতরূপে সত্য। কাজেই) তুমি আমার কথামত চল, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (তা হচ্ছে তওহীদ)। হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদত করো না (অর্থাৎ শয়তানকে এবং তার ইবাদতকে তো তুমিও খারাপ মনে কর। প্রতিমা পূজায় শয়তান পূজা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ শয়তানই এ-কাজ করায়। আল্লাহ্‌র বিপরীতেও কারও শিক্ষাকে সত্য মনে করে তার আনুগত্য করাই ইবাদত। কাজেই প্রতিমা পূজার মধ্যে শয়তান পূজা নিহিত রয়েছে।) নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (অতএব সে আনুগত্যের যোগ্য হবে কিরূপে)? হে আমার পিতা, আমি আশংকা করি (এবং এই আশংকা নিশ্চিত) যে, তোমাকে দয়াময়ের কোন আযাব স্পর্শ করবে (দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে)। অতঃপর তুমি (আযাবে) শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ আনুগত্যে যখন তার সঙ্গী হবে ; তখন সাজায়ও তার সঙ্গী হবে, যদিও দুনিয়াতে শয়তানের কোন আযাব না হয়। শয়তানের এই সঙ্গ ও শাস্তিতে অংশীদার হওয়াকে কোন কল্যাণকামী ব্যক্তি পছন্দ করবে না)।

[ইবরাহীম (আ)-এর এসব উপদেশ শুনে] পিতা বলল ঃ তুমি কি আমার উপাস্য-দের থেকে বিমুখ হচ্ছ, হে ইবরাহীম? (এবং এজন্য আমাকেও নিষেধ করছ? মনে রেখ) যদি তুমি (দেবদেবীর নিন্দা থেকে এবং আমাকে তাদের ইবাদতে নিষেধ করা থেকে) বিরত না হও, তবে আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করব (কাজেই তুমি এ থেকে বিরত হও) এবং চিরতরে আমা থেকে (অর্থাৎ আমাকে বলা-কওয়া থেকে) দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ (উত্তম) আমার সালাম নাও, (এখন তোমাকে বলা-কওয়া নিরর্থক।) এখন আমি তোমার জন্য আমার পালনকর্তার কাছে মাগফিরাতের (এভাবে) দরখাস্ত করব (যে, তিনি তোমাকে হিদায়ত করুন, যদ্দ্বারা মাগফিরাত অর্জিত হয়) নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (কাজেই তাঁর কাছেই আবেদন করব, যার কবুল করা না করা উভয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে রহমত ও মেহেরবানী) এবং (তুমি এবং তোমার সহধর্মীরা যখন আমার সত্য কথাও মানতে চাও না, তখন তোমাদের মধ্যে অবস্থান করা অনর্থক। তাই) আমি তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর, তাদের থেকে (দৈহিকভাবেও) পৃথক হয়ে যাচ্ছি, (যেমন আন্তরিকভাবে পূর্বেই পৃথক রয়েছি। অর্থাৎ এখানে অবস্থানও করব না) এবং (সানন্দে পৃথক হয়ে) আমার পালনকর্তার ইবাদত করব (কেননা, এখানে থাকলে এ কাজেও বাধা সৃষ্টি হবে।) আশা (অর্থাৎ নিশ্চিত বিশ্বাস) করি যে, আমার পালনকর্তার ইবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না (যেমন মূর্তিপূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্যের ইবাদত করে বঞ্চিত হয়। মোট কথা, এই কথাবার্তার পর ইবরাহীম তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে গেলেন)। অতঃপর সে যখন তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে ইসহাক (পুত্র) ও ইয়াকুব (পৌত্র) দান করলাম (তারা তাঁর সঙ্গলাভের কল্যাণে মূর্তিপূজারী সমাজের চাইতে বহুগুণে উত্তম ছিল।) এবং আমি (উভয়ের মধ্যে) প্রত্যেককে নবী করেছি এবং তাদের সবাইকে আমি (নানা গুণে গুণান্বিত করে) আমার অনুগ্রহের অংশ দিয়েছি এবং (ভবিষ্যৎ বংশ-ধরের মধ্যে) তাদের সুখ্যাতি আরও সমুচ্চ করেছি। (ফলে সবাই সম্মান ও প্রশংসা

সহকারে তাদের নাম উচ্চারণ করে। ইসহাকের পূর্বে ইসমাঈল এমনি সব গুণসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল)।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

'সিদ্দীক' কাকে বলে? صديق—صديقا نبيا শব্দটি কোরআনের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ ও সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি, সে সিদ্দীক। কেউ বলেনঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও ওঠাবসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রূহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেষোক্ত অর্থকেই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রসূলের জন্য সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্য নবী ও রসূল হওয়া জরুরী নয়; বরং নবী নয়---এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনি-ও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন। হযরত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরআন পাক 'সিদ্দীকা' (أمه صديقة) উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতে পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদবঃ يا أبت----আরবী অভিধানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্য সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেযাজের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয়---এর উদ্যোক্তারূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যই তিনি সৃজিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يا أبت----শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমত তিনি প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে 'কাফির' গোমরাহ্' ইত্যাদি বলেন নি; বরং পয়গম্বরসুলভ হিকমতের

সাথে শুধু তার দেবদেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত নবুয়তের জ্ঞানগরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শির্কের সম্ভাব্য কুপরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুঁশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে

সম্বোধন করল। হযরত খলীলুল্লাহ্ يَا أَبَتِ বলে মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন

করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় يَا بُنَيَّ (হে বৎস,) শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে يَا إِبْرَاهِيمُ বলে সম্বোধন করল।

অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ্ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ—এখানে سلام শব্দটি দ্বিবিধ অর্থের জন্য হতে পারে। এক, বয়কটের সালাম; অর্থাৎ কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজনোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে সালাম বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহ্র প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে ঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا—অর্থাৎ মূর্খরা যখন তাদের সাথে মূর্খসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তারা তাদের মুকাবিলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেয়। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফিরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ—অর্থাৎ খৃস্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না। কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফির, মুশরিক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ কারণেই কাফিরকে সালাম করার বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে ফিকহ্বিদগণ মতভেদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামের কথা ও কার্য দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং কারও কারও কথা ও কার্য দ্বারা অবৈধতা বোঝা যায়।

কুরতুবী আহকামুল কোরআন গ্রন্থে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। ইমাম নখয়ীর সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন কাফির ইহুদী ও খৃস্টানের দেখা করার ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাকে প্রথমে সালাম করায় দোষ নেই। বিনা প্রয়োজনে প্রথমে সালাম করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এভাবে উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে যায়।---(কুরতুবী)

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي----এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান রয়েছে যে, কোন কাফিরের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রসূলে করীম (স) তাঁর চাচা আবূ তালিবকে বলেছিলেনঃ وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ ---অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ অর্থাৎ নবী ও ঈমানদারদের মুশরিকদের জন্য ইস্তেগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (স) চাচার জন্য ইস্তেগফার পরিত্যাগ করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্য ইস্তেগফার করব---এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বেকার ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়। সূরা মুমতাহিনায় আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করে এ বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ সূরা তওবার مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا আয়াতের পরবর্তী আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ—

এ থেকে জানা যায় যে, এই ইস্তেগফার ও ওয়াদা পিতার কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

এবং আল্লাহ্‌র শত্রু প্রমাণিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। এই সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি ইস্তেগফার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي—একদিকে তো হযরত খলীলুল্লাহ্ (আ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন. যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলংকিত হতে দেন নি। বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেবদেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার ইবাদত করি।

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বঞ্চিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যত এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসংগতার আতংক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন আল্লাহ্‌র জন্য নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেবদেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সন্তানের পিতা হয়েছিলেন, তাও 'ইয়াকুব' (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। পুত্রদান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾
وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ
مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۝٥١ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝٥٢ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۝٥٨

(৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। (৫২) আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গূঢ়-তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারূনকে নবীরূপে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা—নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কিতাবে (অর্থাৎ কোরআনে) মূসা (আ)-র কথাও আলোচনা করুন (অর্থাৎ মানুষকে শোনান, নতুবা কিতাবে আলোচনাকারী তো প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই)। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট (বান্দা) ছিলেন এবং তিনি রসূল ও নবী ছিলেন। আমি তাঁকে তূর পর্বতের ডানদিক থেকে আহ্বান করলাম এবং আমি তাঁকে গূঢ়তত্ত্ব বলার জন্য নিকটবর্তী করলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে (অর্থাৎ তার অনুরোধে তার সাহায্যের জন্য তাকে নবী করলাম এই কিতাবে ইসমাঈলের কথাও বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ওয়াদা পালনে খুব সাচ্চা ছিলেন এবং তিনি রসূল ও নবী ছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাতের (বিশেষভাবে এবং অন্যান্য বিধিবিধানের সাধারণভাবে) নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। এই কিতাবে ইদরীস (আ)-এর কথা আলোচনা করুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত সততাপরায়ণ নবী ছিলেন। আমি তাকে (গুণগরিমায়) উচ্চস্তরে

উন্নীত করেছিলাম। এরা (সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করা হল---যাকারিয়া থেকে ইদরীস পর্যন্ত) এমন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ (বিশেষ) নিয়ামত নাযিল করেছেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেছেন। কেননা, নবুয়তের চাইতে বড় নিয়ামত কিছু আর নেই)। এরা সবাই আমাদের বংশধর (ছিলেন) এবং তাদের কেউ কেউ তাদের বংশধর (ছিলেন), যাদেরকে আমি নূহ্ (আ)-র সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম (সেমতে একমাত্র ইদরীস ছিলেন নূহের পিতৃপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই নূহ্ ও তাঁর সঙ্গীদের বংশধর) এবং (তাদের কেউ কেউ) ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর [ছিলেন। সেমতে হযরত যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও মূসা (আ) তাদের উভয়ের বংশধর। ইসহাক, ইসমাঈল ও ইয়াকুব (আ) ছিলেন শুধু হযরত ইবরাহীমের বংশধর।] তাদের সবাইকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি। (এহেন প্রিয়পাত্র ও বৈশিষ্ট্যশীল হওয়া সত্ত্বেও তাদের বন্দেগীর অবস্থা ছিল এই যে) যখন তাদের সামনে রহমানের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন (চূড়ান্ত মুখাপেক্ষিতা, নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে) তারা সিজদারত ও ক্রন্দনরত অবস্থায় (মাটিতে) লুটিয়ে পড়ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَانَ مُخْلَصًا---আল্লাহ্ তা'আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্য খাঁটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত করে দেয়, তাকে مُخْلَص বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন ; যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ---অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও এই মর্তবা কতক পরিমাণে লাভও করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহ্র হিফাযতে থাকেন।

مِن جَانِبِ الطُّورِ---এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এই নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

الْأَيْمَنِ---তূর পাহাড়ের ডানদিক হযরত মূসা (আ)-র দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তূর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌঁছার পর তূর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

نَجِيًّا---কানাকানি ও বিশেষ কথাবার্তাকে مناجات এবং যার সাথে এরূপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجى বলা হয়।

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ---وهبنا শব্দের অর্থ দান। হযরত মূসা (আ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্য হারূনকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবূল করা হয়। আয়াতে وهبنا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি মূসাকে 'হারূন' দান করেছি। একারণেই হযরত হারূন (আ)-কে هبة الله (আল্লাহ্‌র দান)-ও বলা হয়।---(মাযহারী)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ---বাহ্যত এখানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মূসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত বিশেষ গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা হযরত ইদরীস (আ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ---ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর আলামত বলা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে সাচ্চা; কিন্তু এই বর্ণনা পরম্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণত এইমাত্র হযরত মূসা (আ)-র আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মূসা (আ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিচল নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে,

নিজেকে জবাই-এর জন্য পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্যে সবর করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন দিন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মাযহারী) আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীতে মহানবী (স) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেস্থানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে। ---(কুরতুবী)

ওয়াদা পূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা ঃ ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎ-কর্মপরায়ণ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ العدة دين ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফিকাহ্‌বিদগণ বলেছেন ঃ ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ্। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জোরে-জবরে আদায় করা যায়। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মত ওয়াজিব---বিচারে ওয়াজিব নয়। ---(কুরতুবী)

পরিবার-পরিজন থেকে সংস্কার কাজ শুরু করা সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য ঃ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ---হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায ও যাকা-তের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে ঃ قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং এ ব্যাপারে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ) এ কাজের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রযত্নে চেষ্টিত ছিলেন; যেমন মহানবী (স)-র প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ---অর্থাৎ গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্র করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হিদায়তের জন্য প্রেরিত হন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌঁছান এবং খোদায়ী

নির্দেশের অনুগামী করেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরদের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হিদায়তের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হিদায়ত মেনে নেওয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে তাতে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষাদীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ—হযরত ইদরীস (আ) নূহ্ (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুস্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আ)-এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসূল, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করেন। (যামাখশারী) হযরত ইদরীস (আ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জিযা হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহ্‌রে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণত পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। (বাহ্‌রে মুহীত, কুরতুবী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا—অর্থাৎ আমি ইদরীস (আ)-কে উচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, ইদরীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন ঃ

هذا من اخبار كعب الاحبار الاسرائيليات وفي بعضه نكارة

অর্থাৎ এটা কা'বে আহ্‌বারের ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। এর কোন কোনটি অপরিচিত। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেওয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেওয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাট্য নয়। কোরআনের তফসীর এর ওপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল কোরআন)

রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ বয়ানুল কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ঃ রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত

নিয়ে চিন্তাভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাঈল (আ)-এর শরীয়ত; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয়; যেমন ফেরেশ্‌তা রসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন ঈসা (আ)-এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ বলা হয়েছে অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণত বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী মূসা (আ)-র শরীয়ত প্রচার করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক। এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ একক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লিখিত আয়াতসমূহে رَسُولًا نَّبِيًّا বলা হয়েছে, যেখানে কোন খটকা নেই। কেননা বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ —

এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ —

এখানে ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَإِسْرَائِيلَ —এখানে হযরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া ইয়াহ্‌ইয়া ও ঈসা (আ)-কে বোঝানো হয়েছে।

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا—পূর্ববর্তী

আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশংকা ছিল; যেমন ইহুদীরা হযরত ওযায়রকে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসাকে আল্লাহ্ই বানিয়ে দিয়েছে. তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহ্র সামনে সিজদাকারী এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ছিলেন, এ কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়। ---(বয়ানুল কোরআন)

কোরআন তিলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরদের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং ওলীআল্লাহ্দের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন ঃ কোরআন পাকে সিজদার যে আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সিজদায় দোয়া করা আলিমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণত সূরা সিজদায় এই দোয়া করা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لِوَجْهِكَ الْمُسَبِّحِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ ـ

সূরা বনী ইসরাঈলের সিজদায় এরূপ দোয়া করা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الْبَاكِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ—আলোচ্য

আয়াতের সিজদায় নিম্নরূপ দোয়া করা দরকার ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمُ الْمَهْدِيِّيْنَ السَّاجِدِيْنَ لَكَ الْبَاكِيْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰيَاتِكَ ـ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ
عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلَّا
سَلٰمًا ۚ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ
مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

(৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তার বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তার ওয়াদায় তারা পেঁছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যা তাদের জন্য রুযী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহিযগারদেরকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত ব্যক্তিদের) পর (কতক) এমন অপদার্থ জন্ম-গ্রহণ করল, যারা নামায বরবাদ করে দিল (বিশ্বাসগতভাবে অর্থাৎ অস্বীকার করল অথবা কার্যত অর্থাৎ নামায আদায় করতে অথবা জরুরী হক ও আদবে ত্রুটি করল) এবং (নফসের অবৈধ) খাহেশের অনুবর্তী হল (যা জরুরী ইবাদত থেকে গাফিল করার মত ছিল।) সুতরাং তারা অচিরেই (পরকালে) অনিষ্ট দেখে নেবে (চিরস্থায়ী অনিষ্ট কিংবা অচিরস্থায়ী) কিন্তু যে (কুফর ও গোনাহ্ থেকে) তওবা করেছে, (কুফর থেকে তওবা করার মতলব এই যে) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং (গোনাহ্ থেকে তওবা করার অর্থ এই যে,) সৎকর্ম করেছে। সুতরাং তারা (অনিষ্ট না দেখেই) জান্নাতে প্রবেশ করবে। (প্রতিদান পাওয়ার সময়) তাদের কোন ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ প্রত্যেক সৎকর্মের প্রতিদান পাবে অর্থাৎ) চিরকাল বসবাসের জান্নাতে (যাবে), যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয়ে অবশ্যই তারা পেঁছবে। সেখানে (জান্নাতে) তারা কোন অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না (কেননা সেখানে অনর্থক কথাবার্তাই হবে না। ফেরেশ্তাদের এবং একে অপরকে) সালাম (করা) ব্যতীত। (বলা বাহুল্য, সালাম দ্বারা অনেক আনন্দ ও সুখ লাভ হয়। অতএব তা অনর্থক নয়) তারা সকাল-সন্ধ্যা খানা পাবে। (এটা হবে নির্দিষ্টভাবে। এমনিতে অন্য সময়ও ইচ্ছা করলে পাবে।) এই জান্নাত (যার উল্লেখ করা হল) এমন যে,

আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদেরকে এর অধিকারী করব। (আল্লাহ্‌ভীরুতার ভিত্তি হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلْفٌ ---লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরি, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরি, এবং উত্তম সন্তান সন্ততি। (মাযহারী) মুজাহিদ বলেন ঃ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সৎকর্ম পরায়ণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং প্রকাশ্যে পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমা'আত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ্‌ ঃ আয়াতে 'নামায নষ্ট করা' বলে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, নখয়ী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, উমর ইবনে আবদুল আজীজ প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদের মতে সময় চলে যাওয়ার পর নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে 'নামায নষ্ট করা' বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। (কুরতুবী, বাহ্‌রে মুহীত)

খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশ নামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন ঃ

ان اهم امركم عندى الصلوة فمن ضيعها فهو لما سواها ضيع

আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে ধর্মের অন্যান্য বিধি-বিধান আরও বেশী নষ্ট করবে! (মুয়াত্তা মালিক)

হযরত হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছে না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল ঃ চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন ঃ তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো ---মুহাম্মদ (স)-এর স্বভাবধর্মের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমিযীতে হযরত আবূ মসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসূলে করীম (স) বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে 'একামত' করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদায়, রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

মোটকথা এই যে, যে ব্যক্তি ওযুতে ত্রুটি করে অথবা নামাযের রুকূ-সিজদায় তড়িঘড়ি করে, ফলে রুকূর পর সোজা হয়ে দাঁড়ায় না কিংবা দুই সিজদার মধ্যস্থলে সোজা হয়ে বসে না, সে নামাযকে নষ্ট করে দেয়।

হযরত হাসান (রা) নামায নষ্টকরণ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে বলেন ঃ লোকেরা মসজিদসমূহকে উজাড় করে দিয়েছে এবং শিল্প, বাণিজ্য ও কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

ইমাম কুরতুবী এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেন ঃ আজ জ্ঞানী ও সুধী সমাজের মধ্যে এমন লোকও দেখা যায়, যারা নামাযের আদব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু ওঠাবসা করে। এটা ছিল ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অবস্থা। তখন এ ধরনের লোক কুত্রাপি পাওয়া যেত। আজ নামাযীদের মধ্যে এই পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, نعوذ بالله من شرور انفسنا الا ما شاء الله

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ—شهوات (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লিখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।---(কুরতুবী)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا----আরবী ভাষায় غى শব্দটি رشاد-এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غى বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাইতে অধিক নানা রকম আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'গাই' জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদের জন্য এই গুহা প্রস্তুত করেছেন, তারা হচ্ছে যে, যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপায়ী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখোর সুদ গ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতামাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে দেয়।---(কুরতুবী)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا—لغو বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা, গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীগণ এ থেকে পাক-পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

إِلَّا سَلَامًا---এটা পূর্ব বাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিভাষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতীগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।---(কুরতুবী)

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا---জান্নাতে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদাসর্বদা এক প্রকার আলো বিকীর্যমাণ থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন-রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই প্রকার সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতীগণ তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতীগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে, যেমন এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ---এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহারে অভ্যস্ত। আরবরা বলে ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহার্য যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মু'মিনদের আহার দিনে দু'বার হয়---সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খাহেশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সদাসর্বদা উপস্থিত থাকবে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ---(কুরতুবী)

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ
ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ وَيَقُولُ
الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿٦٧﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ
ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ

أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا
صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ
نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

(৬৪) (জিবরাঈল বলল ঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তার এবং আপনার পালনকর্তার বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তারই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তার সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তান-দেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহ্‌র সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালন-কর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহিযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(শানে নুযুল ঃ সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) একবার হযরত জিবরাঈলের কাছে আরও বেশি বেশি অবতরণের বাসনা প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার অনুরোধের জওয়াব জিবরাঈলের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। জওয়াব এই যে,) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত (যে কোন সময়) অবতরণ করতে পারি না। তাঁরই মালিকানাধীন যা আমাদের সামনে আছে (স্থান হোক কিংবা কাল, স্থান সম্পর্কিত হোক কিংবা কাল সম্পর্কিত) এবং (এমনিভাবে) যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে আছে। (সামনের স্থান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখমণ্ডলের সামনের স্থান, পশ্চাতের স্থান হচ্ছে তার পিঠের দিক্কার স্থান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং। সামনের কাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকাল, পশ্চাতের কাল হচ্ছে অতীতকাল এবং মধ্যবর্তীকাল হচ্ছে বর্তমানকাল) এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (সেমতে এসব বিষয় আপনি পূর্ব থেকেই জানেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমি সৃষ্টিগতভাবে ও আইনগত-

ভাবে আজ্ঞাধীন। নিজের মতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অথবা যখন ইচ্ছা, তখন কোথাও আসা-যাওয়া করতে পারি না। প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁর ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা। সুতরাং (তিনি যখন এমন অধিপতি ও মালিক, তখন হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি তাঁর ইবাদত (ও আনুগত্য) কর এবং (দু'একবার নয় বরং) তাঁর ইবাদতে দৃঢ় থাক। (যদি তাঁর ইবাদত না কর, তবে কি অন্যের ইবাদত করবে?) তুমি কি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কাউকে জান? (অর্থাৎ তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই। অতএব ইবাদতের যোগ্যও কেউ নেই। সুতরাং তাঁর ইবাদত করাই জরুরী।) (পরকালে অবিশ্বাসী) মানুষ বলে ঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত হয়ে পুনরুত্থিত হব? (আল্লাহ্ জওয়াব দেন যে,) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে (অনস্তিত্ব থেকে) অস্তিত্বে এনেছি এবং সে (তখন) কিছুই ছিল না (এমন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা যখন সহজ, তখন দ্বিতীয়বার জীবিত করা তো আরও বেশি সহজ হবে)। সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি তাদেরকে (কিয়ামতে জীবিত করে হাশরের মাঠে) সমবেত করব এবং (তাদের সাথে) শয়তানদেরকেও (যারা দুনিয়াতে তাদের সাথে থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করত ; যেমন অন্য আয়াতে আছে, قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ (অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে এমতাবস্থায় উপস্থিত করব যে, তারা (ভয়ের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে। অতঃপর (কাফিরদের) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে (যেমন ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজারী, মূর্তিপূজারী) তাদেরকে পৃথক করব, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক অবাধ্য (যাতে তাদেরকে অন্যদের পূর্বে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেই)। অতঃপর (এই পৃথক করার কাজে কোনরূপ তদন্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। কেননা,) আমি (স্বয়ং) তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত আছি, যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকার (অর্থাৎ প্রথমে) যোগ্য। (সুতরাং নিজ জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে পৃথক করে প্রথমে তাদেরকে অতঃপর অন্যান্য কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। এই ক্রম শুধু প্রথমে প্রবেশ করার বেলায়। এরপর সবাই সমান। জাহান্নামের অস্তিত্ব এমন সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে তা প্রত্যক্ষ করানো হবে। তবে প্রত্যক্ষ করার উপায় ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাফিরদেরকে প্রবেশ ও চিরকালীন আযাবের জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে এবং মু'মিনদেরকে পুলসিরাত অতিক্রম এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য প্রত্যক্ষ করানো হবে। তারা জাহান্নামকে দেখে যখন জান্নাতে পৌঁছবে, তখন আরও বেশি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত হবে।) এবং (কোন কোন পাপীকে অতিক্রমকালে শাস্তি দেয়া হবে। এটা হবে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে গোনাহ্ থেকে পবিত্রকরণ। তাদেরকে ব্যাপক প্রত্যক্ষকরণের সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে,) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তথায় পৌঁছবে না (কেউ প্রবেশের জন্য এবং কেউ অতিক্রমের জন্য)। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা, যা (অবশ্যই) পূর্ণ হবেই। অতঃপর (এই জাহান্নাম

অতিক্রম করা থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, এতে মু'মিন ও কাফির সব সমান, বরং) আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নেব, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় (করে বিশ্বাস স্থাপন) করত। (হয় প্রথমেই উদ্ধার করব, যেমন কামিল মু'মিনদেরকে, না হয় কিছুকাল আযাব ভোগ করার পর উদ্ধার করব, যেমন পাপী মু'মিনদেরকে।) এবং জালিমদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সেখানে (চিরকালের জন্য) এমতাবস্থায় ছেড়ে দেব যে, (দুঃখ ও বিষাদের আতিশয্যে) নতজানু হয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اصطبار—واصطبر لعبادته শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাজে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতে স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইবাদতকারীর এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

هل تعلم له سميا—سمى শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সমনাম। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাথর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ্' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ্ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাধীনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ্‌র নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কোন সমনা ম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীর-বিদ থেকে এস্থলে শব্দের অর্থ অনুরূপ ও সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ অথবা নজির নেই।

لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم—এখানে والشياطين-এর و—مع (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফিরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উত্থিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফিরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মু'মিন ও কাফির ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মতলব হবে এই যে, প্রত্যেক কাফির তো তার শয়তানের সাথে বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মু'মিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হয়ে যাবে। —(কুরতুবী)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا—হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মু'মিন, কাফির, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতি-বিহবল হয়ে নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মু'মিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশি, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাত লাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ—شيعة শব্দের আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা কোন বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।—(মাযহারী)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا—অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌঁছবে না, এমন কোন মু'মিন ও কাফির থাকবে না। এখানে পৌঁছার অর্থ প্রবেশ নয়—অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রিওয়ায়েতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদি প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মু'মিন ও পরহিযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবূ সুমাইয়ার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্য জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য নমরূদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মু'মিনদেরকে এখান থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার হবে। আয়াতের পরবর্তী ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا বাক্যের অর্থ তাই। এই বিষয়বস্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আয়াতে যে ورود শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ প্রবেশ নেয়া হলেও অতিক্রমের আকারে প্রবেশ হবে। তাই কোন বৈপরীত্য নেই।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ

مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ
لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۚ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا
السَّاعَةَ ۭ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٧٥﴾ وَيَزِيْدُ
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى ۭ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾

(৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলেঃ দুই দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্তবায় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁকজমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ্ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কিয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তবায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। (৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যখন অবিশ্বাসীদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, (যেসব আয়াতে মু'মিনদের সত্যপন্থী হওয়া এবং কাফিরদের মিথ্যাচারী হওয়ার কথা বর্ণিত হয়,) তখন কাফিররা মুসলমানদেরকে বলেঃ (বল, আমাদের) দুই দলের মধ্যে (অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে দুনিয়াতে) মর্যাদা কার শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস কার উত্তম? (অর্থাৎ এটা সুবিদিত যে, পারিবারিক সাজসরঞ্জাম, পরিজন ও পারিষদ-জনিত প্রাচুর্যে আমরাই শ্রেষ্ঠ। এ দাবি তো বাহ্যিকভাবেই অনুধাবন করা যায়। দ্বিতীয় পারিভাষিক দাবি এই যে, দান, অনুগ্রহ ও নিয়ামত ঐ ব্যক্তি পায়, যে দাতার কাছে প্রিয় ও পসন্দনীয় হয়। এই দুই দাবি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরাই আল্লাহ্‌র কাছে পসন্দ-নীয় ও প্রিয় এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ক্রোধে পতিত ও লাঞ্ছিত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এর একটি পাল্টা জওয়াব দিচ্ছেন এবং আরও একটি সত্যিকার জওয়াব দিচ্ছেন। প্রথম জওয়াব এই যে, তারা এসব কথা বলে) এবং (দেখে না যে,) আমি তাদের পূর্বে কত দলকে (ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে--যা নিশ্চিত আযাব ছিল) বিনাশ করেছি। তারা সম্পদে ও জাঁকজমকে এদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল। [এতে বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় দাবিটি ভ্রান্ত। বরং কোন উপকারিতা ও রহস্যের কারণে পার্থিব নিয়ামত অপসন্দনীয়

ও অভিশপ্তকেও দেয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হচ্ছে এই যে, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি] বলুন ঃ যারা পথভ্রষ্টতায় আছে, (অর্থাৎ তোমরা) আল্লাহ্ তাদেরকে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন (অর্থাৎ পার্থিব নিয়ামতের রহস্য হচ্ছে শিথিলতা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা, যেমন অন্য আয়াতে আছে أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ—এই অবকাশ ক্ষণস্থায়ী)। অবশেষে যে বিষয়ের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে, তা যখন তারা দেখে নেবে---আযাব হোক (দুনিয়াতে) অথবা কিয়ামত হোক (পরকালে), তখন তারা জানতে পারবে যে, কে মর্তবায় নিকৃষ্ট এবং দলবলে দুর্বল (অর্থাৎ তারা দুনিয়াতে পারিষদ-বর্গকে সাহায্যকারী মনে করে এবং গর্ব করে; সেখানে জানতে পারবে যে, তাদের শক্তি কতটুকু। কেননা, সেখানে কারও কোন শক্তি থাকবেই না। একেই أَضْعَفُ বলা হয়েছে।) এবং (মুসলমানদের অবস্থা এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা পথপ্রাপ্তদের পথ-প্রাপ্তি (দুনিয়াতে) বৃদ্ধি করেন (অর্থাৎ এটাই আসল সম্পদ। এর সাথে ধন-দৌলত না থাকলেও ক্ষতি নেই।) এবং (পরকালে প্রকাশ পাবে যে,) স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণামেও উত্তম। (অতএব তারা সওয়াব হিসেবে বড় বড় নিয়ামত পাবে। তন্মধ্যে গৃহ, বাগবাগিচা সবই থাকবে। এসব সৎ কর্মের পরিণাম হচ্ছে অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়িত্ব। সুতরাং মুসলমানদেরই শেষ অবস্থা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক দিয়ে উত্তম হবে। বলা বাহুল্য, শেষ অবস্থাই ধর্তব্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا—এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাফিররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। এক. পার্থিব ধন-দৌলত ও সাজসরঞ্জাম এবং দুই. চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফিরদের কাছে বেশী ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্য নেশার কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঁজিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃত করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণগরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্থিব ধন-দৌলত, সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তি-গত গুণগরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাথী মনে করে না; সাথে সাথে মুখেও আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহ্র বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফিল হয় না। তারাই শুধু পার্থিব ধন-দৌল-তের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণত অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সুলায়মান (আ), হযরত দাউদ (আ) এবং অনেক বিত্তশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার

অনেক ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ্‌ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফিরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণ-স্থায়ী নিয়ামত ও সম্পদ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনের চাইতেও বেশি লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশি ধন-দৌলত স্তূপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের আধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমত দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়ত যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্মে নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্য? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী-সাথী হবে না।

—وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ--এর তফসীর সম্পর্কে নানাজনের নানা মত বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সূরা কাহ্‌ফে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ বলে যেসব ইবাদত ও সৎ কর্মের উপকারিতা স্থায়ী, তাই বোঝানো হয়েছে। مَرَدًّا শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তনস্থল। এখানে পরিণাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎ কর্মই আসল সম্পদ। সৎ কর্মের সওয়াব বিরাট এবং পরিণাম চিরস্থায়ী শান্তি।

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ
الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ
وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾ وَّنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾
وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

(৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে ঃ আমাকে অর্থসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি

অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (৭৯) এ তো নয় ঠিক সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ্‌ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়! (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ) আপনি কি সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীতে (তন্মধ্যে পুনরুত্থানের নিদর্শনও রয়েছে, যেগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয ছিল) বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং (ঠাট্টার ছলে) বলে ঃ আমাকে পরকালে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে। (উদ্দেশ্য এই যে, এ ব্যক্তির অবস্থাও আশ্চর্যজনক। অতঃপর খণ্ডন করা হচ্ছে ঃ) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে অথবা সে কি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (এ বিষয়ে) কোন অঙ্গীকার লাভ করেছে? (অর্থাৎ এ দাবি সম্পর্কে সে কি প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান লাভ করেছে, যা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভের নামান্তর, নাকি পরোক্ষ-ভাবে জানতে পেরেছে? এ দাবিটি যেহেতু যুক্তিভিত্তিক নয়; বরং বর্ণনাশ্রয়ী, তাই বর্ণনাশ্রয়ী প্রমাণই অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার বর্ণনাই এর প্রমাণ হতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরূপ বর্ণনা করেননি। কাজেই দাবিটি সম্পূর্ণ অবান্তর।) কখনই নয় (সে মিথ্যা বলে), সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং (যথাসময়ে এরূপ শাস্তি দেব যে,) তার শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব (অর্থাৎ সে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। আমিই সব কিছুর মালিক হব এবং কিয়ামতে আমি তাকে দেব না; বরং) সে আমার কাছে (ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছেড়ে) একাকী আসবে। তারা আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে, যাতে তাদের জন্য তারা আল্লাহ্‌র কাছে) সম্মান লাভের কারণ হয়। (যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে--- وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ অতএব এরূপ) কখনই নয় (বরং) তারা তো (কিয়ামতে স্বয়ং) তাদের ইবাদতই অস্বীকার করে বসবে (যেমন সূরা ইউনুসের তৃতীয় রুকূতে বর্ণিত হয়েছে, وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ---) এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (কথায়ও, যেমন বর্ণিত হল এবং অবস্থায়ও তা'ই হবে। অর্থাৎ সম্মানের পরিবর্তে অপমানের কারণ

হয়ে যাবে। এসব উপাস্যের মধ্যে প্রতিমাও থাকবে। সুতরাং তাদের কথা বলা যেমন يكفرون শব্দের দ্বারা বোঝা যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্গের কথা বলার অনুরূপ অসম্ভব নয়।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا---বুখারী ও মুসলিমে হযরত খাব্বাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি 'আস ইবনে ওয়ায়েল কাফিরের কাছে কিছু পাওনার তাগাদায় গেলে সে বলল ঃ তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। খাব্বাব জওয়াব দিলেন ঃ এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আস বলল ঃ ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে।---(কুরতুবী)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফিরের জওয়াবে বলেছে ঃ সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনর্বার জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি উঁকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে?

أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলা বাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? ---وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ অর্থাৎ সে যে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা, দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে।

وَيَأْتِينَا فَرْدًا---কিয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا---অর্থাৎ এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফিররা যাদের ইবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীতে তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে ঃ